ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো

চিত্রা দেব

প্রখ্যাত গবেষিকা-লেখিকার প্রিয় বিষয় বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ইতিহাস। সে-ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান 'ঠাকুরবাড়ি'র। কেমন ছিল সেকালের ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো? ইতিহাস খুঁড়লেন, ইতিহাস টুঁড়লেন চিত্রা দেব।

'এ বাড়ির প্রথম দুর্গাপুজো খোলার ঘরে হয়,' বলেছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা নীলমণি ঠাকুরের একমাত্র কন্যা কমলমণি। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগারো, স্মৃতিচারণা করছেন বৃদ্ধবয়সে, তবু ঘটনাটি তাঁর মনে গভীর দাগ কেটেছিল, কেন-না জন্মাবধি তিনি দুর্গাপুজো দেখেছিলেন দারুণ জাঁকজমকের মধ্যে, যৌথ ঠাকুরপরিবারে একটাই পুজো হত তখন, পাথুরিয়াঘাটার সাবেক বাড়িতে। যদিও একান্নবর্তী তিন ভাইয়ের পরিবার, ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজো বিখ্যাত হয়েছিল দর্পনারায়ণ ঠাকুরের নামে। কলকাতায় তিনি অতি মান্যগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। হয়েছিলেন 'আট বাবুর' একজন। তারও আগে নীলমণি ও দর্পনারায়ণের পিতা জয়রাম ঠাকুর—তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আনন্দীরামের আগেই মৃত্যু হয়েছিল—দুর্গাপুজো করতেন কি না জানা যায়নি। অষ্টাদশ শতকের কলকাতায় যাঁরা দু-আড়াই টাকার চাকরি করতেন তাঁরাও বাড়িতে দুর্গাপুজো করতেন। জয়রাম ছিলেন আমিন, আর্থিক সংগতি তাঁর যথেষ্ট ছিল। গৃহদেবতা ছিলেন লক্ষ্মীজনার্দন। জয়রাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধাকান্ত জিউ-এর মন্দির। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর সেবার জন্য দিয়েছিলেন তিনশো বিঘা নিষ্কর জমি। কাজেই ধর্মপ্রাণ বাঙালি হিসেবে জয়রামের গৃহে দুর্গাপুজো হওয়াই স্বাভাবিক। হয়তো হতও আর পাঁচটা বাড়ির মতো। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গাপুজো এবং সেই উৎসবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের যোগদানে বাঙালি বাবুদের চোখে শারদীয় দুর্গোৎসব অন্য মাত্রা পেল। মনে

হয়, অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে দর্পনারায়ণ বিত্তে-প্রতিপত্তিতে অন্য বাবুদের সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। তাঁর বাড়িতে পুজো দেখতে সাহেবরা আসতেন। শুধু তাই নয়, নিমন্ত্রণ পাওয়ার আশায় পথ চেয়ে বসে থাকতেন। ১৭৯২ সালের 'ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল্'-এ দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বাড়ির দুর্গাপুজোর আগাম খবর ছাপা হয়েছিল তাঁদের এই আগ্রহের কথা মনে রেখে।

নীলমণি ও দর্পনারায়ণের সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে মতান্তর ও মনান্তর হওয়ায় ১৭৮৪ সালে ঠাকুর পরিবার দুভাগে বিভক্ত হয়। এর কয়েক বছর আগে ছোটভাই গোবিন্দরাম দেহত্যাগ করেন। নীলমণি জোড়াসাঁকোয় এসেছিলেন ১৭৮৪-র জুন মাসে, পুজোর সময় তাঁর পাকাবাড়ি বা ঠাকুরদালান কিছুই হয়নি, নিতান্ত অব্যবস্থার মধ্যে তাঁকে পুজো করতে দেখে ধারণা করা চলে, ঠাকুরবাড়িতে দুর্গাপুজো জয়রাম বা তাঁর পিতা পঞ্চাননের সময়ে আরম্ভ হয়েছিল। এইসময় থেকে ঠাকুর পরিবারের দুর্গাপুজো ভাগ হয়ে গেল।

ভাগ হল। কিন্তু মূল ব্যাপারটি বিভক্ত হল না। সেকালে প্রতিটি পরিবারের দুর্গামূর্তির আলাদা বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রতি পরিবারের ছিল নিজস্ব কুমোর, নিজস্ব পোটো। প্রতি পরিবারে মায়ের মুখের ছাঁচ হত স্বতন্ত্র, তাকে বলা হত দেবাঙ্গ মূর্তি। পাঁচ-ছয় পুরুষ ধরে মূর্তি গড়েছেন বিভূতি পাল, হরিনারায়ণ পাল প্রমুখ। প্রত্যেক ঠাকুরবাড়িতেই তাঁদের পরিবারের কেউ না কেউ মূর্তি গড়তেন। মূর্তি গড়া হত দুর্গা বা চণ্ডীদালানে, ঠাকুরদালানও বলা হত তাকে। এবাড়ির পুজোয় প্রতিমার কাঠামো খুব বড় হত না। মূর্তির আকার মূর্তিশিল্পীদের ভাষায় ন পো-র মতো। জমকালো চালচিত্রের নিচে সপরিবারে মা দুর্গা, পায়ের কাছে অসুর, মাথার ওপরে শিবঠাকুর। মূর্তির বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্গাপ্রতিমার মুখের ছাঁদে, 'মূর্তিকারেরা বসাতেন মঙ্গোলীয় আদল কিন্তু টানা হরিণ চোখ'—লিখেছেন সন্দীপ ঠাকুর। শুধু তাই নয়, ত্রিনয়না দুর্গা। দুটি পাখি ছাড়া হত। মা দুর্গাকে কৈলাস থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে বলে শঙ্খচিল, আবার বিজয়ার দিনে বিকেল চারটের আগেই উড়িয়ে দেওয়া হত নীলকণ্ঠ পাখি, মহাদেবকে খবর দেবে বলে। ঠাকুরবাড়ির পুরুষেরা প্রতিমার সঙ্গে গঙ্গাতীরে যেতেন নতুন পোশাক পরে। গঙ্গার ধারে গিয়ে প্রতিমা স্থাপন করা হত দুটি নৌকোর মাঝখানে। মাঝগঙ্গায় গিয়ে নৌকো দুটি দুপাশে সরে গিয়ে নিরঞ্জন সম্পূর্ণ করত।

দর্পনারায়ণ ঠাকুরের পরে তাঁর সাত পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র গোপীমোহন ও হরিমোহনের দুর্গাপুজোর কথা শোনা যায়। অন্য পুত্রেরা পুজো করতেন কি না জানা যায়নি। গোপীমোহন ঠাকুরের দুর্গাপুজো দেখতে বা নৃত্য-গীত-ভোজ্য-পানীয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে সাহেব-সুবোরা আসতেন। আসতেন চিৎপুরের নবাবও। জেনারেল ওয়েলেসলি বা ডিউক অব ওয়েলিংটন এসেছিলেন একবার। মহাসমারোহের জন্য গোপীমোহনের অট্টালিকার সামনে, অপরিসর পথে তিনদিন 'পদব্রজে লোকের গমনাগমন হওয়া ভার ছিল', লেখা হত সংবাদপত্রে। সেকালে ধনীব্যক্তিরা সযত্নে বসতবাটী বা বৈঠকখানা নির্মাণ করলেও পথঘাট ও পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন।

গোপীমোহন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, আমন্ত্রিত অতিথিদের সঙ্গে কখনও পানাহার করতেন না। দুর্গাপুজো হত ঠাকুরদালানে যাবতীয় নিয়ম মেনে। গোপীমোহন মুলাজোড়ে ব্রহ্মময়ীর নবরত্ন মন্দির ও দ্বাদশ শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতায় হত শারদীয়া ও বাসন্তী দুর্গোৎসব। বলিদানের খবর পাওয়া যায় তবে বীভৎসভাবে নয়, শাস্ত্রানুসারে। মুলাজোড়ে ছাগ ও মহিষ বলি হত।

গোপীমোহন ঠাকুরের ছয় পুত্র, তাঁরা পিতার মতো মহাড়ম্বরপূর্ণ দুর্গাপুজো করার পক্ষপাতী

ছিলেন না। বিষয়সম্পত্তি ভাগ করে স্বতন্ত্র হয়ে গেলেও তাঁরা পুজো করতেন 'পালা' করে। কনিষ্ঠ পুত্র প্রসন্নকুমারের 'পালা' যখন পড়ল, সকলেই উৎসুক হয়ে রইলেন তিনি পুজো করেন কি না দেখার জন্য। কেন-না তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অনুগামী; সতীদাহ, অন্তর্জলিযাত্রা প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি দুর্গাপুজো করেছিলেন পারিবারিক প্রথা মেনেই।

যদিও পরবর্তী কালের, তবু প্রসন্নকুমারের দৌহিত্র শেষেন্দ্রভূষণ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী বিনয়িনী দেবীর স্মৃতিকথায় এবাড়ির পুজো অন্তঃপুরিকারা কীভাবে দেখতেন তা জানা যায়। তাঁরা সন্ধ্যারতি দেখতে আসতেন দুর্গাদালানে, হয়তো দাঁড়াতেন চিকের আড়ালে, সেকথা স্পষ্ট নয়। বিনয়িনী লিখেছেন, ''রুপোর প্রদীপদানিতে একহাজার আটটি ঘৃতপ্রদীপ দিয়ে রুপোর ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি আরম্ভ হল। প্রতিমার দুপাশে মস্ত দুইটা পিতলের প্রদীপ। মার বুক পর্যন্ত উজ্জ্বল প্রদীপ, এক সের ঘৃত ধরে। এইরূপ প্রদীপ দিনরাত তিন দিন ধরে জ্বলবে।'' বিশাল প্রদীপদানি, বিশাল প্রদীপ, রুপোর চামর প্রভৃতির বিবরণ থেকে মনে হয় গোপীমোহন ঠাকুরের সময়ও আরতি এভাবেই হত।

এই পরিবারের ঢাকি, ঢুলি প্রভৃতিরাও কুমোর ও পটুয়াদের মতো কয়েক পুরুষ ধরে নিযুক্ত হতেন। পুরোহিত সম্বন্ধেও একথা বলা চলে।

প্রসন্নকুমারের অগ্রজ হরকুমার অতি আচারনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন দুজনেই কালীভক্ত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহন প্রসন্নকুমারের বিপুল সম্পত্তি পান, তিনি মহাসমারোহে দুর্গাপুজো করতেন। সেই পুজোর সমকালীন বিবরণ কিছুটা হলেও পাই তাঁর কন্যা মনোরমা দেবীর লেখা 'পিতৃদেবচরিতে' :

''পূজার সময় ধূম কহা নাহি যায়
কত রকমের বাদ্য বাজয়ে তথায়
রাত্রি পর্যন্ত কত কাঙালি খাইত
পাড়ার প্রতিবেশী আর যে যত আসিত
সরকারে ডাকিয়া মহারাজা কন
যে যত খাইবে তারে দিবে সেইক্ষণ...
তিন দিন অন্নভোগ ছড়াছড়ি কত
ঠিক যেন অন্ন-ক্ষেত্র হয় সেইমত।''

লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এই বিবরণে প্রাধান্য পেয়েছেন সাধারণ মানুষ। এঁদের জন্যই হত

''থিয়েটার, যাত্রা, নাচ আর চণ্ডীগান
আর কত রকমের উৎসব বিধান।''

যতীন্দ্রমোহনের পুজোয় চণ্ডীগানের বিশেষত্ব ছিল, প্রথমে একজন, পরে তাঁকে ঘিরে কয়েকজন গান গাইতেন। গান শুরু হত প্রতিপদের দিন, শেষ হত নবমীর রাতে। প্রসন্নকুমারও পুজোর সময় চণ্ডীর গানের ব্যবস্থা করতেন। হয়তো এ-ব্যবস্থা ছিল পুরুষানুক্রমিক। ঠাকুরবাড়িতে আরতির সময় পুরুষেরা দুর্গাদালানে উপস্থিত থাকতেন। যতীন্দ্রমোহন উপস্থিত থাকতেন সন্ধিপুজোর সময়:

''সন্ধিপূজার সময় হলে উপস্থিত
ধূপ-ধুনা-ধূমে গৃহ আঁধার হইত...
সন্ধিক্ষণে জপে তিনি বসিতেন যখন
ঠিক যেন উমাপতি তপোনিমগন।''

যতীন্দ্রমোহন বিজয়ায় স্বয়ং যেতেন প্রতিমার সঙ্গে। এসময়, হয়তো তার আগে থেকেই, প্রতিমা নিরঞ্জন হত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে।

''যান যবে বিজয়াতে ঠাকুর লইয়া
সঙ্গে তাঁর কত লোক যায় যে চলিয়া
ঠাকুরের সঙ্গে কত শোভাযাত্রা যেত...।''

শৌরীন্দ্রমোহন তাঁর বাড়িতে দুর্গাপুজো করলেও সে-পুজোর খবর পাওয়া যায় না। পার্ক লেনে তাঁর উত্তরপুরুষেরা দুর্গাপুজো করতেন। পৌত্র ক্ষেমেন্দ্রমোহন ছিলেন শিল্পী, নিজেই মূর্তি গড়তেন, সঙ্গে থাকতেন কুমোর বিভূতি পাল। এসময়ে প্রতিমা একটু ছোট করা হত, কুমোরদের

হিসেবে পাঁচ পো। বলি হত না। সুরজিৎকুমার ঠাকুর জানিয়েছেন পৌরোহিত্য করতেন হেমন্ত, পশুপতি, পরে ক্ষুদিরাম ঘোষাল। ইনি কিছুদিন দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী মন্দিরের পূজারি ছিলেন।

দর্পনারায়ণের অপর পুত্র পরমভক্ত হরিমোহন রাধাকান্ত জিউ-এর প্রাত্যহিক সেবার ভার নেন ছোটভাই মোহিনীমোহনের সঙ্গে। ভাই দীর্ঘজীবী হননি। হরিমোহন নিষ্ঠাভরে দুর্গাপুজো করতেন, তবে গোপীমোহনের মতো সাড়ম্বরে নয়। বলি হত না, ভোগ হত নিরামিষ। উত্তরপুরুষ দেবনন্দন ঠাকুর জানিয়েছেন, শাস্ত্রানুযায়ী একটি ছাগ বলি হত কালীঘাটে, এ-প্রথা পরবর্তী কালেরও হতে পারে কেন-না পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরদের অনেকেই শাক্ত হয়েছিলেন।

মহিষমর্দিনী

মোহিনীমোহনের পুত্রদের গৃহে নিশ্চয় দুর্গাপুজো হত। পৌত্র কালীকৃষ্ণ ও তাঁর স্ত্রী সৌদামিনী দুজনেই ছিলেন শক্তিসাধক। বিশেষ করে সৌদামিনী দেবী ছিলেন মা দুর্গার ভক্ত, উচ্চকোটির সাধিকা, তিনি স্বপ্নাদেশ পেয়ে কামাখ্যা থেকে কবচ আনিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন শিবরানি মাকে। এই শিবরানি মা-ই দেবী দুর্গা। দেবীর অদৃশ্য উপস্থিতি এঁদের উত্তরপুরুষেরা এখনও অনুভব করেন। প্রতি বছর তিনদিন পুজো হয় ঘটে, শিবরানি মা-র মূর্তির সামনে। সুদীপ ঠাকুর জানিয়েছেন এ-ব্যবস্থা এযুগের। একসময় কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়িতে মহাসমারোহে দুর্গাপুজো হত। তাঁর বাড়িতে এই উপলক্ষ্যে থিয়েটার হত। ১৮৯১ সালে সিটি থিয়েটারের বায়না ছিল, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে অভিনেত্রী তিনকড়ির প্রথম সাক্ষাৎ হয় এখানেই। পরে রাজা প্রফুল্লকুমার ঠাকুরের সময়ে এঁদের দুর্গাপ্রতিমার আকার হত খুব বড়, মনে হয় এ-সময় কলকাতায় আকারে প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে প্রতিমা গড়া হত।

ফিরে আসি জোড়াসাঁকো ঠাকুর-বাড়ির দুর্গাপুজো প্রসঙ্গে। কমলমণি খোলার ঘরে প্রথম পুজো দেখলেও এবাড়ির দুর্গাপুজো পরে, বিশেষত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় বর্ণাঢ্যভাবে অনুষ্ঠিত হত। তবে সে-পুজোয় সাহেব-মেমদের ভিড় হত না, দ্বারকানাথ তাঁদের পুজোমণ্ডপে নিয়ে আসার চেষ্টাও করেননি। সাধারণ মানুষের জন্য যাত্রা, সং প্রভৃতি থাকত। অভিজাতদের জন্য বসত নৃত্যগীতের আসর। এ-বাড়ির পুজো ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে আরম্ভ হয়, বন্ধ হয় ১৮৫৮ সালে। দ্বারকানাথের সময় পরিবারের পুরুষদের সকলকেই তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদালানে আসতে হত। আরতির পর সকলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন। দেবেন্দ্রনাথ যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে গেলেন তখনও পিতার

বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেননি। তিনি তাঁর ভাইদের নিয়ে একটি দল করেন এবং আরতির পর সকলে নত হয়ে প্রণাম করলেও তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকতেন। ''আমরা প্রণাম করিলাম কি না কেহই দেখিতে পাইত না''—লিখেছেন দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর ভাইয়েরা পরবর্তী কালে দুর্গাপুজোর প্রতি আগ্রহ বোধ করেন, তাঁরাই পুজোর ব্যবস্থা করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছেন, ''পুজোর সময় আমার পিতৃদেব কখনও বাড়িতে থাকিতেন না... পূজার ভার আমার দুই কাকা স্বর্গীয় গিরীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়দের উপর ন্যস্ত থাকিত।'' গিরীন্দ্রনাথ ১৮৫৪ সালে ও নগেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সালে পরলোকগমন করেন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্রদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতিতে তাঁদের বাড়ির দুর্গাপুজোর কথা আছে। সত্যেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন তাঁদের বাড়িতে দুর্গা ও জগদ্ধাত্রীপুজো হত, লক্ষ্মীয়, বাসন্তীপুজো হত না। তিনি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে প্রতিমা নির্মাণ দেখতেন, ''প্রথমে খড়ের কাঠামো, তার উপর মাটি, খড়ির প্রলেপ, তার উপর রং, ক্রমে চিত্রবিচিত্র খুঁটিনাটি আর আর সমস্ত কার্য, সবশেষে অর্ধচন্দ্রাকৃতি চালের পরে দেবদেবীর মূর্তি আঁকা, তাতে আমাদের চোখের সামনে বৈদিক, পৌরাণিক দেবসভা উদ্‌ঘাটিত হত।'' একই ধরনের উৎসাহ ছিল বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ''কুমোরেরা বাড়িতেই প্রতিমা নির্মাণ করিতে আসিত। প্রথম যখন গোরুর গাড়ি করিয়া প্রতিমা নির্মাণের কাঠামো আসিয়া পড়িত, তখন হইতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঔৎসুক্য আরম্ভ হইত। তারপর খড় বাঁধা, একমাটি, দোমাটি, রং দেওয়া, মুণ্ড বসানো প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিমাখানি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িয়া উঠিত তখন তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না।... তারপর আবার চালচিত্র। কত হাতি ঘোড়া দেবদেবীর মূর্তি পটুয়াদিগের নিপুণ তুলিকায় সাদাজমির উপর নানা রঙে ফুটিয়া উঠিত—তিনি একমনে বসিয়া তাহাই দেখিতেন।''

সত্যেন্দ্রনাথের ভাল লাগত সং দেখতে। রামায়ণ পালার সং, শুম্ভনিশুম্ভ পালার সং প্রভৃতি শিশুমনে দাগ কাটত বেশি। এছাড়া যাত্রাগান, নৃত্যগীত সবই হত বাড়ির উঠোনে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আনন্দও কম ছিল না। ''কাষ্ঠস্তম্ভের মাথা হইতে বক্র লোহার শিকে ঝাড় ঝুলিতেছে। সায়াহ্নে যখন সেইসব জ্বালানো হইত, তখন ছেলেমহলে কি আনন্দ।'' বৈষ্ণব পরিবার বলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সবসময়ই ছাগের বদলে কুমড়ো বলি হত। বেশি বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ ভেবেছেন, ''তখনকার পূজায় আমোদপ্রমোদ যাত্রা উৎসবের মধ্যে সাত্ত্বিক ভাব, আধ্যাত্মিকতা কি ছিল এক একবার ভাবি। দালানে গিয়ে সন্ধ্যার আরতি দেখতে যেতুম, তাতে ধূপধুনা বাদ্যধ্বনির মধ্যে আমরা ঠাকুরকে প্রণাম করে আসতুম। এত বাহ্য আড়ম্বরের মধ্যে এই যা ভিতরকার আধ্যাত্মিক জিনিস।'' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কথায় বসন্তকুমার লিখেছেন, ''আরতির সময় ধূপধূমে সমাচ্ছন্ন দেবীর অস্পষ্ট মুখখানি তাঁহার মনে অজানা রহস্যের এক সুন্দর মোহজাল বিস্তার করিত।''

বিজয়ার দিনটিও ছিল আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। সত্যেন্দ্রনাথের মনে হত ''দুর্গা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিদায় নিয়ে চল্লেন, মনে হত সত্যিই দেবীর চক্ষে জল এসেছে।'' বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ''এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবাবু বলিলেন, 'বিজয়ার দিন প্রাতে আমাদের বাড়িতে বিষ্ণু গায়কের গান হইত। আমরা সকলে বসিয়া একত্রে শান্তির জল লইতাম, তারপর প্রতিমা বাহির হইত। অপরাহ্ণে আমরা অভিভাবকগণের সহিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া ভাসান দেখিতাম। প্রতিমা বিসর্জনের পর বাড়ি আসিয়া বুকটা বড়ই ফাঁক ফাঁক ঠেকিত—মনটাও কেমন একটু খারাপ হইয়া যাইত।' ''

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবী লিখেছেন, ''আমাদের বাড়িতে যখন দুর্গোৎসব ছিল ছেলেরা বিজয়ার দিনে নূতন পোশাক পরিয়া প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে চলিত—আমরা মেয়েরা সেই দিন তেতালার ছাদে উঠিয়া প্রতিমা বিসর্জন দেখিতাম। তখন বৎসরের মধ্যে সেই একদিন আমরা তেতালার ছাদে উঠিবার স্বাধীনতা পাইতাম।'' তিনি আরও জানিয়েছেন, ''দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমার নিকট অঞ্জলি দিয়া তবে জলগ্রহণ করিতে পাইতাম।''

নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আর দুর্গোৎসব হয়নি, তবে দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা রমানাথ ঠাকুরের কয়লাহাটার বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ''আমাদের বাড়িতে পুজো না থাকলেও পুজোর আবহাওয়া এসে লাগত আমাদের বাড়িতে। ষষ্ঠির আগেই নেমন্তন্ন আসত।'' এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা যেতে পারে সেকালে দুর্গাপুজোর নিমন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত আবশ্যিক। বাড়ির একটি বালককে অন্যান্যদের সঙ্গে প্রতিনিধি হিসেবে পাঠানো হত। শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ না বুঝেই রাজা রামমোহন রায়কে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, রাজার বিস্মিত দৃষ্টি এবং প্রশ্ন সেই বয়সেই তাঁকে বিচলিত করেছিল। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, যাত্রার আসরে ''আমাদের জায়গা ছোটোকর্তার বসবার পিছনে একদিকে। ছোটোদের বড়ো ভালবাসতেন তিনি। আরতির সময়ও আমরা তাঁর চারপাশে সামনে পিছনে হাতজোড় করে সারি দিয়ে দাঁড়াতুম।'' বড়কর্তা ছিলেন দ্বারকানাথ আর ছোটকর্তা রমানাথ।

দুর্গাপুজো না হলেও জোড়াসাঁকোর বকুলতলার বাড়ি অর্থাৎ গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে হত বিজয়া সম্মিলনী। অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''আমাদের বাড়িতেই বসত মস্ত জলসা। খাওয়া-দাওয়া, মিষ্টিমুখ, আতর, পান, গোলাপজলের ছড়াছড়ি। ঝাড়বাতি জ্বলছে। বিষ্টু ওস্তাদ তানপুরা নিয়ে গানে গানে মাত করে দিতেন। তাঁর গলায় বিজয়ার সেই করুণ গান শুনে মেয়েরা চিকের আড়ালে চোখের জল ফেলতেন। কী তাঁর গান—

আজু মায়ে লয়ে যায় সহে না প্রাণে।
যার প্রাণ যায় সেই জানে।'' ✠

সহায়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমাদের সেকালের পুজো* (অবনীন্দ্র রচনাবলী ১)

২। অর্ণব নাগ, *কলকাতার ঠাকুরগোষ্ঠীর কুলদেবতা* (*স্বস্তিকা* পূজাসংখ্যা, ১৪২০)

৩। ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনী*

৪। নগেন্দ্রনাথ বসু ও ব্যোমকেশ মুস্তাফি, *বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস*, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ভাগ ৩

৫। সম্পাদক : প্রশান্তকুমার পাল, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, *জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি*,

৬। বিনয়িনী দেবী, *কাহিনী* (*শারদীয়া দেশ*, ১৪১০)

৭। মনোরমা দেবী, *পিতৃদেবচরিত*

৮। লোকনাথ ঘোষ, *কলকাতার বাবুবৃত্তান্ত*, অনুবাদ: শুদ্ধোদন সেন,

৯। সম্পাদক : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, *শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী*

১০। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, *আমার বাল্যকথা*

১১। সন্দীপ ঠাকুর, *জনদিগন্ত*

১২। সৌদামিনী দেবী, *পিতৃস্মৃতি ও অন্যান্য রচনা*

[মহিষাসুরমর্দিনীর ছবিটি প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী **অতসী বড়ুয়া**-র আঁকা (১৯৯২)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রী সুপ্রভা দেবীর তিনি পৌত্রী, বিখ্যাত শিল্পী অসিতকুমার হালদারের কন্যা, এবং স্বনামধন্য বৌদ্ধ দার্শনিক ড. অরবিন্দ বড়ুয়ার স্ত্রী। তাঁকে অতসী নাম দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছবিটি আমরা পেয়েছি লেখিকার সৌজন্যে।]